কালের কণ্ঠ
রবিবার। ৭ আষাঢ় ১৪২৭। ২১ জুন ২০২০। ২৮ শাওয়াল ১৪৪১

টাকা-পয়সার দিকে কোনো দিন তাকাইনি

ছেলেটি রেডিও শুনতে ভালোবাসত, বাবাকে না জানিয়ে লুকিয়ে তাই বেতারে অডিশন দিল। এরপর গণমাধ্যমেই কেটে গেল জীবনের ৫০টি বছর। বিটিভির প্রথম প্রজন্মের প্রযোজক মোস্তফা কামাল সৈয়দের মুখোমুখি হয়েছেন ওমর শাহেদ। ছবি তুলেছেন কাকলী প্রধান

১৩ অক্টোবর, ২০১৭ ০০:০০ | পড়া যাবে ২০ মিনিটে

প্রিন্ট

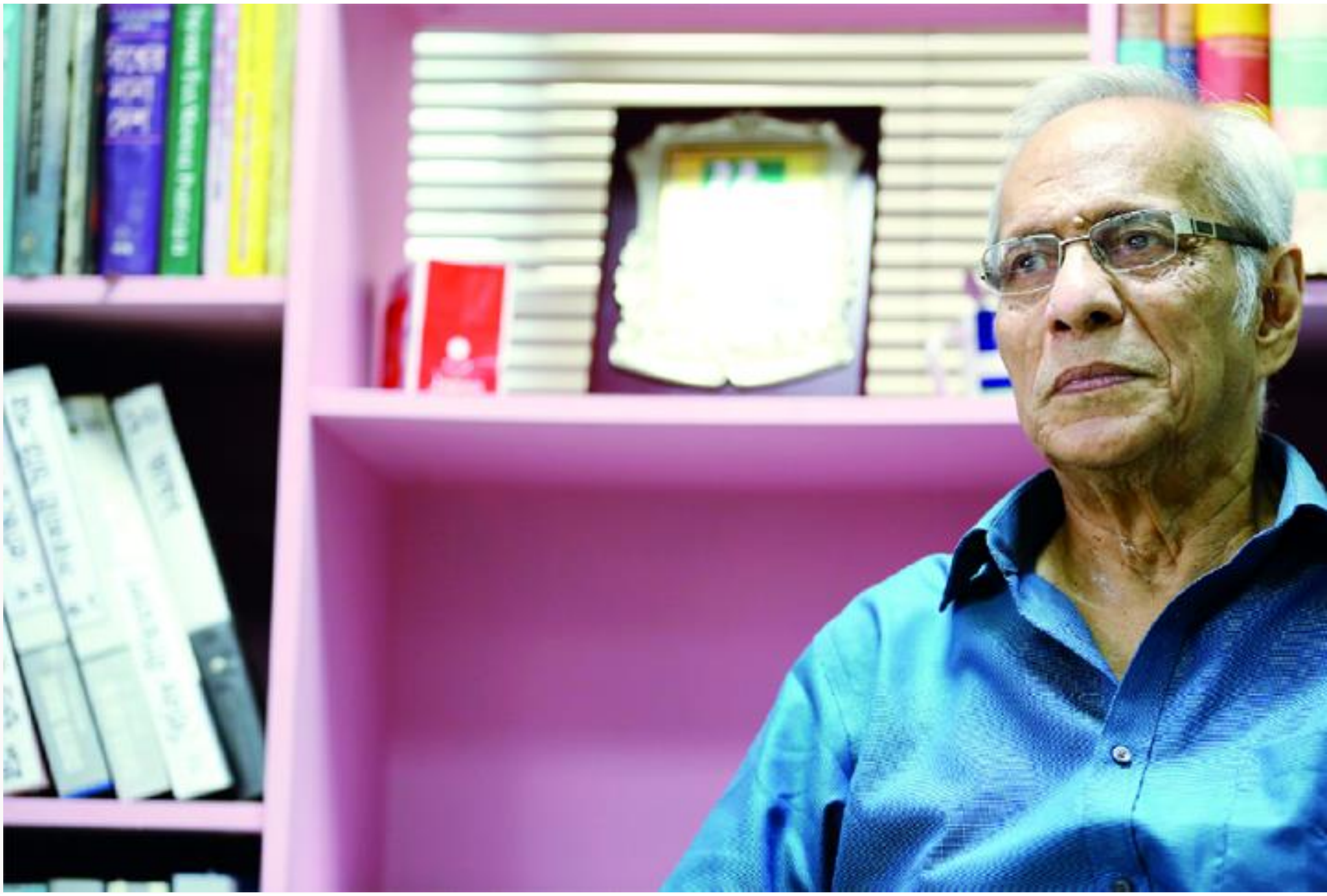

অ- অ অ+

রেডিওতে গেলেন কিভাবে?
আমাদের সময় একমাত্র বিনোদনের মাধ্যম ছিল রেডিও। ছোটবেলা থেকে গান শোনার খুব শখ ছিল। বাংলা, হিন্দি—সব গান শুনতাম। অনুষ্ঠান প্রচারের আগে ঘোষকদের ঘোষণা শুনে শখ হলো—তাঁদের মতো করে বলব। ‘সেভেন অ্যান্ড হাফ ইঞ্চি স্পুল’ নামের টেপ রেকর্ডারে তাঁদের মতো অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করে রেকর্ড করতাম। ভারী গলায় কণ্ঠ, উচ্চারণ, শব্দচয়ন খেয়াল করে মনে হতো, খারাপ হচ্ছে না। তবে বাবা বেতারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সৈয়দ জিল্লুর রহমান চাইতেন না, বেতারে কাজ করি। তাঁকে না জানিয়ে ১৯৬০ সালে প্রথম ঢাকা বেতারে কথিকা পাঠ করলাম। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানটি কবি ফররুখ আহমদ সঞ্চালনা করতেন। তখন সব অনুষ্ঠানের লাইভ সম্প্রচার হতো। ১৫ টাকা সম্মানী পেলাম।

বেতারে তো অভিনয়ও করেছেন।
এরপর অনেক দিনের বিরতি। ঢাকা বেতারের এআরডি (অ্যাসিস্ট্যান্ট রিজিওনাল ডিরেক্টর) আতিকুল হক চৌধুরী নাট্য বিভাগের প্রধান ছিলেন। সেই সময় রণেন কুশারী ‘নাট্য প্রযোজক’ ছিলেন। তিনি জানতেন, রেডিওতে গেলে বাবা আপত্তি করবেন। তবে তাঁর মনে হয়েছিল, আমি হয়তো অভিনয় করতে পারব। তাই তিনি বাবাকে প্রায়ই বলতেন, ‘ওর প্রতিভা আছে, চেপে রাখা ঠিক নয়।’ বাবা আর আপত্তি করেননি। তবে তাঁকে না জানিয়ে লুকিয়ে অডিশন দিয়ে পাস করেছিলাম। প্রথম প্রগ্রামটি ছিল একটি ‘জীবন্তিকা’। ১০ মিনিটের উন্নয়নমূলক এ অনুষ্ঠানে আমার বিপরীতে ছিলেন লায়লা হাসান। কাফি খানও ছিলেন। বেতারে তখন প্রতি বুধবার এক ঘণ্টার নাটক হতো। এটি খুব জনপ্রিয় ছিল। প্রথম নাটকটি করলাম বেতারের প্রকৌশলী নুরুল্লাহর প্রযোজনায় হান্স ক্রিস্টিয়ান অ্যান্ডারসনের গল্প অবলম্বনে ‘অসুন্দর’। ছোট ছেলের চরিত্র, বিপরীতে হেনা কবীর। এটি প্রেমের নাটক। অনেক নাটকে অভিনয় করেছি। ঈদুল ফিতরে নাজমুল আলমের প্রযোজনায় ‘ফিরে এলো’তে অন্ধ ছেলের চরিত্র করলাম। মায়ের ভূমিকায় রওশন জামিল। আবদুল্লাহ আল মামুনের লেখা ‘আকাশের রং কালো’তেও অন্ধের চরিত্র করেছি। গলা ভারী বলে তখনকার সিনিয়র অভিনেত্রী রোজী মজিদ, ড. সাঈদুন্নেসা হাসান, সাদেকা সাঈদের সঙ্গে অভিনয় করতাম। পরের প্রজন্মের নায়িকাদের সঙ্গেও অভিনয় করেছি। বেতারে সব সময় নায়কের পার্ট করেছি। মিতা চৌধুরীর সঙ্গে নজরুলের ‘ঝিলিমিলি’ করেছি। ফেরদৌসী মজুমদারের সঙ্গেও অভিনয় করেছি। মমতাজউদদীন

আহমদের লেখা ‘সকালের সুখ’ নাটকে আমার বিপরীতে ছিল সুবর্ণা মুস্তাফা। ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় একটি জীবন্তিকায় আনজুমান আরা বেগমের সঙ্গে অভিনয় করেছি। খান আতাউর রহমান ভাইয়ের সঙ্গে ‘মেহেদীর অনেক রঙ’ করেছি। নাটকের জন্য মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ফতেহ লোহানী ভাই বলতেন, ‘একটু দূরে সর। না হলে তোর আর আমার গলা একরকম মনে হবে!’ তাঁর গলাটিও ছিল ভরাট। শুরু করেছিলাম ১৫ টাকায়, পরে ১০০ থেকে ১৫০ টাকা পেয়েছি। বহু দিন অভিনয়ের পর টিভি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ায় রেডিওর প্রতি আগ্রহ কমে গেল। চার কী পাঁচ বছর আগে মমতাজ স্যার অনুরোধ করলেন, ‘এই নাটকটি আপনার জন্যই লেখা।’ ‘ফিরে এসো সজনী’র। হাজারখানেক সম্মানী দিল। একসময় বেতারে সংগীতানুষ্ঠানগুলোর ধারাবর্ণনাও দিতাম।

অনেক বিজ্ঞাপনেও তো কণ্ঠ দিয়েছেন?

শুরু করেছিলাম ১৯৬৬ সালে। একদিন হঠাত্ ডেকে বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক খোন্দকার নুরুল আলম জিঙ্গেলে কণ্ঠ দেবার জন্য অফার করলেন। কোনো কিছুই পরিকল্পনা করে হয়নি, হঠাত্ সুযোগ এসেছে। তিনি ‘রূপবান’-এর পরিচালক সালাউদ্দিনের ঢাকা রেকর্ড স্টুডিওতে নিয়ে গেলেন। কণ্ঠ দিলাম। এরপর থেকে কণ্ঠদান শুরু হলো। সে সময় আমিই প্রধান ও ব্যস্ততম পুরুষ কণ্ঠ ছিলাম। যখনই জিঙ্গেলে ইমোশনাল বেইজড কণ্ঠ প্রয়োজন হতো, ডাক পড়ত। সাফাত আলীর ‘ইপশা’ থেকে শুরু করে এমন কোনো অডিও স্টুডিও নেই, যেখানে কণ্ঠ দিইনি। পরিচালক ইবনে মিজানের তৈরি ব্যাংকের বিজ্ঞাপনসহ আরো কয়েকটি ব্যাংকের বিজ্ঞাপনেও কণ্ঠ দিয়েছি। কখনো সম্মানী নিয়ে কাউকে কিছু বলিনি। অনেক প্রামাণ্যচিত্রেও ধারাবর্ণনা দিয়েছি। ডিএফপির তৈরি ‘মওলানা ভাসানী’, ‘শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক’-এর তথ্যচিত্রে আমার কণ্ঠ আছে। সর্বশেষ চাষী নজরুলের (ইসলাম) ওপর তৈরি তথ্যচিত্রে কণ্ঠ দিয়েছি। কাজী হায়াত্ হঠাত্ একদিন এফডিসিতে ডেকে নিয়ে তাঁর ছবিতে কণ্ঠ দিতে অনুরোধ করলেন। তাঁর অনেক ছবিতে ধারাবর্ণনা দিয়েছি। ‘রঙিন নবাব সিরাজউদ্দৌলা’, হুমায়ূন আহমেদের ‘শঙ্খনীল কারাগার’-এর শুরুর ধারাবর্ণনাও আমার। আমার আরেকটি শখ হলো খুব গান শুনি। ছাত্রাবস্থায় খোন্দকার ভাইয়ের ‘ইস ধারতি পর’ ছবিতে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকে ছিলাম। মামুন ভাইয়ের ‘সারেং বউ’ ছবিতে আবহ সংগীতে কাজ করেছি। আলম খান ছবিটির মূল সংগীত পরিচালক ছিলেন। বিটিভিতে যত গানের অনুষ্ঠান করেছি, সবই গান শুনে নিজের

আইডিয়ায় করেছি। ‘ভয়েস অব আমেরিকা’র স্টুডিওতে অনুষ্ঠান রেকর্ড করে আমেরিকায় পাঠানো হতো। তাতেও ভয়েস দিয়েছি। ইচ্ছা ছিল, বিবিসি বা ভয়েস অব আমেরিকায় ভয়েস কাস্টার হিসেবে চেষ্টা করব। চেষ্টা করলে হয়তো নির্বাচিত হতাম।

টেলিভিশন ক্যারিয়ার কিভাবে শুরু হলো?

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিল—টিভিতে প্রযোজক নেওয়া হবে। স্কেল ৪৫০ টাকা। বাবা বললেন, ‘এদিকে তোর আগ্রহ আছে, টিভির ভবিষ্যত্ ভালো।’ আবেদন করলাম। হঠাত্ ডাকে টেলিগ্রাম এলো, ‘ইউ হ্যাভ সিলেক্টেড অ্যাজ অ্যা ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রডিউসার।’ তাঁরা জানালেন, প্রশিক্ষণকালীন সময়ে সাকল্যে ২০০ টাকা পাব। যদিও প্রডিউসার পদে পরীক্ষা দিয়েছিলাম, যোগ দিলাম। টেলিভিশনে তখন কলিম শরাফী, জামিল চৌধুরী, জামান আলী খান, আবদুল্লাহ আল মামুন, মোমিনুল হক, মোহাম্মদ জাকারিয়া, খালেদা ফাহমিরা কাজ করছেন। জাপানের এনইসির সঙ্গে যৌথভাবে পিটিভির শুরু। ১৯৬৬ সালের শেষের দিকে রাওয়ালপিন্ডিতে জার্মানির অর্থায়নে শুরু হওয়া টেলিভিশন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে গেলাম। জায়গাটির নাম ‘চাকলালা’। শীতের মধ্যে চার মাসের থিওরিটিক্যাল প্রশিক্ষণ শুরু হলো। তবে হঠাত্ সরকার সিদ্ধান্ত নিল, ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে রাওয়ালপিন্ডি স্টেশন চালু হবে। ফলে চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ শুরু হলো। ফ্লোর ম্যানেজার, স্টুডিও কন্ট্রোলারের দায়িত্বও পালন করতে হয়েছে। প্রযোজকদের সবাইকে একটি করে অনুষ্ঠান তৈরি করতে বলা হলো। বিষয় নির্ধারণ করে বাংলায় আলোচনা অনুষ্ঠান তৈরি করলাম। ফাইনাল টেস্টের জন্য লাইভ অনুষ্ঠান প্রযোজনার দায়িত্ব দেওয়া হলো। ‘কাট টু কাট’ শট নেওয়া হবে। ক্যামেরাম্যানকে বললাম, ‘এই পরীক্ষায় পাস করতে না পারলে তো চাকরি হবে না।’ আমার পেছনে ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ আসলাম আজহার বসেছিলেন। তিনি দেখলেন, ঠিকমতো কমান্ড দিতে পারছি কি না, শট নিতে পারছি কি না। এরপর তিনি আমাকে ও মোস্তাফিজুর রহমানকে সরাসরি ‘প্রযোজক’ নিয়োগ দিয়ে দিলেন। আমরা রাওয়ালপিন্ডিতে প্রশিক্ষণ নেওয়া প্রথম ব্যাচ। এক মাস চাকরির পর কোথায় থাকব—সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিলেন। ঢাকায় চলে এসে ১৯৬৭ সালের ১ এপ্রিল ডিআইটির টেলিভিশন ভবনে যোগ দিলাম।

ডিআইটির অবস্থা কেমন দেখলেন?

প্রথম যেদিন এলাম, বসার জায়গাও ছিল না। একটি রুমের বাইরে লম্বা বেঞ্চ পাতা। প্রথম

দিনই আমাকে একটি অনুষ্ঠান প্রযোজনা করতে দেওয়া হলো। অনুষ্ঠানটির প্রধান অতিথি ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। প্রশিক্ষণকালে করা কুইজ অনুষ্ঠানের আদলে শিক্ষামূলক 'হ্যাঁ' বা 'না' প্রযোজনার দায়িত্ব দেওয়া হলো। ফজলে লোহানী উপস্থাপনা করতেন।

সুরবিতানের দায়িত্ব পেলেন কিভাবে?

বিটিভিতে তখন প্রতি তিন মাসের প্রান্তিকের কোন প্রান্তিকে কখন, কোন অনুষ্ঠান হবে সেসব মনিরুল আলম স্যার নির্ধারণ করতেন। 'সুরবিতান' তাঁরই প্রগ্রাম। তিনি জানতেন, গানের প্রতি আমার ভালোবাসা আছে। যোগদানের পরপরই ১৯৬৭ সালে একদিন তিনি ডেকে বললেন, 'চলো, আজ আমার পেছনে বসে দেখবে। পরের অনুষ্ঠান থেকে প্রযোজনা করবে।' অনুষ্ঠানটিতে তিনটি গান থাকত। দুই শিল্পী একটি করে সলো গাইতেন, অন্যটি দ্বৈত কণ্ঠ। ১৫ মিনিটের অনুষ্ঠান। তাঁর পেছনে বসে দেখছি। কুষ্টিয়ার শিল্পী বেলা পারভীন ও নীনা হামিদের স্বামী এম এ হামিদ গাইছেন। ক্যামেরাম্যানকে মনির ভাই হেডফোনে নির্দেশ দিচ্ছেন। দুই ক্যামেরায় 'ওয়ান টু ওয়ান শট' বদলানোর সময় হঠাত্ একটি শটে ইচ্ছা করেই কি না আজও জানি না, তিনি গড়বড় করে ফেলে রাগ করে টেবিলের ওপর হেডফোন ফেলে দিয়ে মাঝপথে উঠে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হেডফোন কানে দিয়ে পুরো অনুষ্ঠান আমাকে সরাসরি সম্প্রচার করতে হলো। এর পর থেকে 'সুরবিতান' প্রযোজনা করতে হয়েছে। মহাপরিচালক হিসেবে আমিরুজ্জামান খান যোগদানের পর তাঁকে গিয়ে বললাম, 'স্যার শিল্পীরা আসেন, নিজেদের মতো গেয়ে চলে যান। এখানে শট নির্ধারণ করা ছাড়া আমার তো আর কিছু করার সুযোগ থাকে না।' 'কী করতে চান?' 'নতুন গান প্রচার করতে চাই।' 'করুন, অসুবিধা নেই।' খোন্দকার ভাইকে গিয়ে বললাম, 'নতুন গানে সুর করতে হবে।' তিনি সম্মতি দিলেন। গীতিকার ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানও রাজি হয়ে গেলেন। সে মাসের চারটি অনুষ্ঠানে নতুন গান প্রচারিত হলো। এর পর থেকে সব নতুন গান প্রচারিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটি নিয়মিত প্রযোজনা করেছি। শুধু একটি প্রান্তিকে মনিরুল আলম মামুন ভাইকে দিয়ে অনুষ্ঠান তৈরি করিয়েছিলেন। তিনি ফের নাটকে ব্যস্ত হয়ে গেলে আবার আমার হাতেই এটি ফিরে এলো। অবশ্য অন্য অনুষ্ঠানগুলোও প্রযোজনা করতে হতো।

এ অনুষ্ঠানে অনেক জনপ্রিয় গানের জন্ম হয়েছে।

শাহনাজ রহমতউল্লাহর একটি অনুষ্ঠান একটি গল্প বলি—কেরামত মাওলা সারা রাত সেট

ডিজাইন করলেন। রেকর্ডিংয়ের সময় জর্জেটের সাদা শাড়ি, সাদা কাপড় ফ্যানে বেঁধে ফ্যান চালিয়ে দিলেন। একটি গান ছিল, 'একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়।' গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা, শাহনাজ রহমতউল্লাহর ভাই আনোয়ার পারভেজের সুর। প্রথম অনুষ্ঠানে এই গানটির তেমন সাড়া পড়ল না। তবে দ্বিতীয়বার প্রচারের পর থেকেই হিট। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গানটি খুব পছন্দ করতেন। কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান কাভার করলেই এটি আমাদের রাখতে হতো। মার্শাল টিটোসহ রাষ্ট্রীয় অনেক অতিথির সম্মানে আয়োজন করা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আমাদের তৈরি করতে হয়েছে। এখন সেগুলো শিল্পকলা একাডেমিতে হয়।

বড় শিল্পীদেরও তো টেলিভিশনে এনেছেন?

সাবিনা ইয়াসমিন তখন বেতারে গাইছেন। আবদুল আহাদের সুরে বেতারে তাঁর একটি গান ভালো লাগল। খোন্দকার ভাইকে বললাম, 'বেতারে একটি ভালো কণ্ঠ এসেছে, নাম সাবিনা। ওকে টিভিতে নিয়ে আসা প্রয়োজন।' তখনো নীলুফার ইয়াসমিন সংগীতশিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেননি। বোনের সঙ্গে তিনিও ডিআইটিতে এলেন। দুজনের অডিশন নিলাম। টিভিতে সাবিনার প্রথম অনুষ্ঠানটি আমার প্রযোজনা ছিল। মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী তাঁর বিপরীতে ছিলেন। খোন্দকার ভাই সংগীত পরিচালক। পরে তাঁরা দুই বোনই বিখ্যাত হয়েছেন।

শিল্পীদের নিয়ে তো অনেক স্মৃতি আছে।

তখন যোগাযোগমাধ্যম এত ভালো ছিল না। ফলে বড় শিল্পীদের বাসায় গিয়ে অনুষ্ঠানের কথা বলে আসতে হতো। তাঁরা খুব আন্তরিক ছিলেন। ফিরোজা (বেগম) আপা খুব নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি একটি পর্বে কাজী নজরুল ইসলামের 'মমতাজ' গাইবেন। একটিমাত্র স্টুডিওতে লাইভ প্রচার করা হতো বলে আগে সারা দিন নিয়মিত অনুষ্ঠান সেরে রাতে স্পেশাল প্রগ্রাম করা হতো। তিনি বাসায় বসে আছেন। আগেও তাঁর বাসায় গিয়েছি। ঢাকার ভূতের গলিতে থাকতেন। গিয়ে দেখি, কমল দাশগুপ্ত বসে বসে লিখছেন। জিজ্ঞেস করার পর হাত ইশারা করে ভেতরের রুমে যেতে বললেন। আপাকে বললাম, 'রাতে এসে নিয়ে যাব।' তিনি রাজি। মুস্তাফা মনোয়ার শিল্পীদের নিয়ে কোনো কাজ করলেই আমাকে যেতে অনুরোধ করতেন। ভোর ৪টায় সেটের কাজ সেরে তিনি বললেন, 'একা গেলে সমস্যা হবে। তুমিও চলো।' গেলাম। তিনি দেখেই বললেন, 'আমি তোমাদের

জন্য অপেক্ষা করছি। চলো।' রেকর্ডিং সেরে তাঁকে বাসায় পৌঁছে দিলাম। স্বাধীনতার পর রুনা লায়লা বাংলাদেশে এলে টিভিতে তাঁকে নিয়ে আমি প্রথম অনুষ্ঠান করেছি। তিনি ও তাঁর বোন দীনা লায়লা স্টুডিওতে এলেন। আলতাফ মাহমুদের সুরে তাঁর আগের গান 'নোটন নোটন পায়রাগুলো' গাইলেন। রিহার্সালের পর লাইভ শুরু হলো। ডিজাইন বিভাগ থেকে একটি খাকি রঙের কাগজ দেওয়া হলো। সেটির ওপর 'চারকোল' কলমে গান লিখে দীনা ধরে রাখলেন, তিনি গাইলেন। এ ছাড়া হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত রবিশংকর, ভূপেন হাজারিকাসহ যত বড় মাপের শিল্পী এ দেশে এসেছেন বিটিভিতে তাঁদের গানের অনুষ্ঠানগুলো আমি করেছি। তাঁরা খুব অমায়িক ছিলেন। যেভাবে বলেছি, সহযোগিতা করেছেন।

নাটকে কিভাবে এলেন?

ডিআইটি থেকে নাটক শুরু করলেও ম্যাগাজিন থেকে শুরু করে টিভির সব ধরনের অনুষ্ঠানই প্রযোজনা করতে হয়েছে। ডিআইটিতে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের উপস্থাপনায় ছয়টি আনন্দমেলার প্রযোজনা করেছি। এর পর তিনি আর সময় করতে পারলেন না। শেষ অনুষ্ঠানটি ৯০ মিনিট হয়েছে। নিয়মিত নাট্য প্রযোজনায় অনেক পরে এসেছি। প্রথম নাটকের নাম 'সেকেন্ড হ্যান্ড'। প্রধান চরিত্রটি আবুল খায়ের করেছেন। ডিআইটিতে আমার অনেক নাটকে সুজাতা নায়িকা ছিলেন। তাঁর অভিনীত একটি নাটকের নাম 'পদত্যাগ'। গোলাম মোস্তফা নায়ক ছিলেন। একটি নাটকে কবরী নায়িকা ছিলেন। তখন তাঁরা সিনেমায়ও নায়িকা। সমরেশ বসুর বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে আমার 'অয়নান্ত'র মাধ্যমে আল মনসুর ও মিতা চৌধুরী জুটি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগে কয়েকটি নাটক করলেও এ নাটকের 'রাজা' চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে আল মনসুর বিখ্যাত হলো। আশির দশকে হুমায়ূন আহমেদের 'নন্দিত নরকে' প্রযোজনা করেছি। তখন মিতা চৌধুরীর বিদেশির সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে, সে চলে যাবে। মামুন ভাই বললেন, 'রাবেয়া চরিত্রটি মিতা ভালো করতে পারবে, রেকর্ড করে রাখুন।' তার অংশ শুটিং করলাম। প্রচারের পর বিচিত্রাতে জাহানার ইমাম সমালোচনা লিখলেন। সবাই প্রশংসা করলেন। তবে হুমায়ূন মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে আমেরিকা থেকে হাতে লেখা চিঠি পাঠালেন, 'আমার উপন্যাস অবলম্বনে নাটক বানিয়েছেন; কিন্তু আমার অনুমতি না নিয়ে ভীষণ অন্যায় করেছেন। অতিদ্রুত মায়ের হাতে সম্মানী পৌঁছে দিন, না হলে অন্য ব্যবস্থা নেব।' অ্যাকাউন্টস অফিসারকে ডেকে নগদ টাকা দিয়ে তাঁর স্বাক্ষর নিয়ে লেখককে

জানালাম। তিনি দেশে এলেন, পরিচয় গাঢ় হলো। তিনি নিজেই ‘এইসব দিনরাত্রি’র ধারাবর্ণনার অনুরোধ করলেন। মোস্তাফিজ ভাইয়ের ‘পারলে না রুমকী’র মাধ্যমে ‘আফজাল-সুবর্ণা’ জুটির যাত্রা হলেও আমার অনেক নাটকে অভিনয় করে তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের নিয়ে যত নাটক তৈরি করেছি, সবই সফল। উল্লেখযোগ্য—‘নীলয় না জানি’, ‘বন্ধু আমার’। আমার শেষ নাটক ‘নীরবে নিঃশব্দে’ও অভিনয় করেছে। এটিও মমতাজ স্যারের লেখা। স্যারের অনেক নাটক করেছি। তাঁর সংলাপ খুব সমৃদ্ধ, চিত্রনাট্য ভালো। আমাদের সময়ে সেসব নাটকের বিষয়বস্তু ছিল, নির্মাতা হিসেবে অনেক ইমোশন জড়িয়ে ছিল। চাকরিকে কখনো চাকরি হিসেবে দেখিনি। টাকা-পয়সার দিকে কোনো দিন তাকাইনি। জীবন তো চলেই গেছে। রামপুরায় চলে আসার পর প্রশাসনিক দায়িত্ব পাওয়ায় তেমন নাটক তৈরি করতে পারিনি। তার পরও ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত তিন মাস অন্তর নাটক বানিয়েছি।

অন্যতম সেরা নাটক ‘কূল নাই কিনার নাই’।

সে প্রান্তিকে মাসে তিনটি নাটক মামুন ভাই, আতিক ভাই ও আমি প্রযোজনা করেছি। এ নাটকটি নাসির উদ্দীন ইউসুফের নির্মাণের কথা থাকলেও তিনি বললেন, ‘মমতাজ স্যারের অনেক নাটক বানিয়েছেন। এটিও করুন।’ দোনোমনো করছিলাম, ‘সব সময় শহরের নাটক বানিয়েছি। ফোক, গ্রামীণ নাটক তো বানাইনি।’ স্যার, আবদুল ওদুদের মূল উপন্যাসটি পড়তে দিলেন। মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা লেখা। খুব সাধারণ গল্প। বললাম, ‘গ্রামীণ জীবনকে আধুনিকভাবে দেখাতে চাই। যেন গ্রাম্যতা, ভাঁড়ামো না থাকে।’ তিনি চিত্রনাট্য তৈরি করলেন। চার দিন শুটিং করলাম। শেষ দৃশ্যটি সংলাপনির্ভর। বললাম, ‘নদীতে এত সংলাপ কিভাবে চিত্রায়ণ করব? সব থাকুক, শেষ দৃশ্যে অফ ভয়েজ করে দিন। মাঝে মাঝে দুই-একটি সংলাপ থাকবে। এক্সপ্রেশনে দৃশ্যটি বন্দি করব।’ তখন ডাবিংয়ের তেমন সুযোগ ছিল না। দৃশ্যটি ছিল, সুবর্ণার স্বামী মারা গেছেন। আফজাল সাবেক প্রেমিকাকে নৌকায় নিয়ে আসছে। ১৯৮৫ সালের মার্চে ১১৪ মিনিটের নাটকটি প্রচারের পর দর্শকের প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হলো। এখনো তারা একে তাদের ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা কাজ বলে। এশিয়ান ড্রামা ফেস্টিভালের জাপান থেকে এক অতিথি এসে নাটকটি দেখে উত্সবের জন্য নির্বাচন করলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে টেপসহ স্ক্রিপ্ট পাঠালাম। তাঁরা দৈর্ঘ্য সামান্য কমিয়ে জাপানি ভাষায় ডাবিং করলেন। নাটক দেখানোর পর জাপানের সাধারণ মানুষও সুবর্ণাকে চিনে ফেলল। এ দেশের একমাত্র টিভি

নাটক হিসেবে এটি জাপানের ‘এনএইচকে’ ও চীনের ‘চায়না সিটি টিভি’তে প্রচারিত হয়েছে। সাজ্জাদ কাদির এই চীনা টিভিতে কাজ করতেন। তিনি চীনা ভাষায় সাবটাইটেল করেছিলেন। এরপর প্রশাসনিক কারণে আমার আর নাটক করা সম্ভব ছিল না।

গুরুত্বপূর্ণ সব প্রশাসনিক দায়িত্বেই ছিলেন।

এরপর প্রমোশন পেয়ে ডিডিজি (ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল) হলাম। প্রশাসনিক দায়িত্বে খুব ব্যস্ত থাকতে হতো। প্যাকেজ নাটক প্রচারের পরিকল্পনা আমার হাতেই বাস্তবায়িত হয়েছে। মুস্তাফা মনোয়ারের হাতে এটি শুরু হলেও নিয়মনীতি তৈরি ও বাস্তবায়ন করেছি। খেয়াল করলাম, যেহেতু তেমন নিয়োগ হচ্ছে না, আমরা বিটিভির প্রথম প্রজন্মের কর্মীরা চলে গেলে কর্মী সংকট সৃষ্টি হবে। ভেবে দেখলাম, বাইরে থেকে নাটক নিলে বিটিভির সঙ্গে মেশানো যাবে না। অনেক জটিলতা হবে। কারণ তাঁরা আমাদের কর্মী, সুবিধা নিয়ে কাজ করার সময় আপনারা সহযোগিতা করছেন না বলতে পারেন। বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে ভেবে দেখলাম, পুরো অনুষ্ঠানটিই তাঁরা তৈরি করে জমা দেবেন। আমরা কিনে নেব। এভাবে অনুষ্ঠান ক্রয় ও চাঙ্ক পদ্ধতির সরকারি নীতিমালা তৈরি করা হলো। চাঙ্ক পদ্ধতি আমার মস্তিষ্কপ্রসূত। বিভিন্ন চ্যানেলে এখন ক্রিকেট খেলা এভাবেই দেখানো হয়। তবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় বিটিভি থেকে বাধা আসতে লাগল। তাঁরা ভাবলেন, কাজ কমে যাবে, চাঙ্ক পদ্ধতিতে বিটিভির লস হবে, অনেক কথা উঠল। একপর্যায়ে আন্দোলন হলো, কর্মচারী ইউনিয়ন আমাকে ‘অবাঞ্ছিত’ ঘোষণা করল। তবে প্যাকেজের মাধ্যমে বিটিভিতে ফ্রিলান্সারদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হলো। বাইরের দক্ষ কর্মীরা টিভি প্রডাকশনের সঙ্গে যুক্ত হলেন। এই যে তরুণ প্রজন্ম টিভি প্রডাকশনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, আজকের টিভি ইন্ডাস্ট্রির প্রসার ঘটেছে, এটি প্যাকেজ চালুর মাধ্যমে হয়েছে। নিজের ভবিষ্যত্ নয়, আমি চেয়েছি, টিভির প্রসারের জন্য একে আকাশের মতো উন্মুক্ত করে দিতে হবে, যাতে বাইরের মেধা যুক্ত হতে পারে। ভাবনাটি ভারতের দূরদর্শন থেকে পেয়েছি। তারাই প্রথম ফ্রিলান্সারদের সুযোগ করে দিয়েছে। এরপর ভারতে টিভি ইন্ডাস্ট্রি কত প্রসারিত হয়েছে! তাদের নিয়ম-কানুনগুলো আমি এখানে বাস্তবায়িত করেছি। বিটিভির গুরুত্বপূর্ণ সব পদেই কাজ করেছি। প্রথম মেয়াদে ১২ বছর জেনারেল ম্যানেজার। পরের মেয়াদে জেনারেল ম্যানেজার ও ডিডিজি প্রগ্রাম ছিলাম। এক বছর নিউজের দায়িত্বে ছিলাম। আমার কোনো কলিগ এত পদে কাজের সুযোগ পাননি। ডিডিজি নিউজের দায়িত্বে এক বছর থাকার সময় রিপোর্টিংধর্মী নিউজ করার চেষ্টা

করেছি। বলেছিলাম, সরকারের নানা বিষয় আমাদের তুলে ধরতে হয়; কিন্তু সেটি কেন রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারছি না? তখন দুই-একটি রিপোর্টিং হয়েছে, এখন তো সেভাবেই খবর প্রচার হয়। ডিরেক্টর ইন্টারন্যাশনাল থাকার সময় উল্লেখযোগ্য ভালো ভালো ছবি, অনুষ্ঠান দেখাতে পেরেছি। 'মুভি অব দ্য উইক' দেখার জন্য মানুষ বসে থাকত। ক্যাটালগ দেখে, বিদেশে গিয়ে খোঁজ করে অস্কার পাওয়া ছবিগুলো দেখানো শুরু করলাম। আইসিসিসহ ক্রিকেটের বিভিন্ন আসর প্রচার শুরু করলাম। ডিডিজি প্রগ্রাম হিসেবে অবসর নিয়েছি।

এনটিভিতে অনুষ্ঠান উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা?

ওখানে প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকায় অনেক কিছু করতে পারিনি। তবে এখানে ক্রিয়েটিভ কাজের সঙ্গে অনেক যুক্ত হতে পেরেছি। বিভিন্ন অনুষ্ঠান ভালো করার জন্য প্রযোজকদের পরামর্শ দিয়েছি, নিজেও আইডিয়া দিয়ে যাচ্ছি। এনটিভির ১৫ বছরের জীবনের প্রথম থেকেই টেলিভিশনের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান নাটক। মানসম্পন্ন নাটক নির্মাণের জন্য ভালো এবং যোগ্য নির্মাতাদের সুযোগ করে দিয়েছি, তাদের প্লাটফর্ম গড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এখনো আমার এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ফলে এই স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে এ দেশের ভালো অভিনেতা-অভিনেত্রী ও নির্মাতারা তৈরি হয়েছেন। এনটিভি তার সূচনা লগ্ন থেকেই মানসম্পন্ন এবং রুচিশীল অনুষ্ঠান প্রচার করে আসছে এবং যা কিছু প্রথম তার শুরু এনটিভি থেকেই। যেমন এখানে সঙ্গীত বিষয়ক রিয়েলিটি শো, কুকিং শো, কমেডি শো এবং আরো অনেক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে। এনটিভিই প্রথম 'কিছু কথা কিছু গান' করেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের নাম না বললেই নয়। যেমন সৈয়দ আবদুল হাদীর উপস্থাপনায় 'কিছু কথা, কিছু গান', ফেরদৌসী রহমানের নিজের গীত গান এই প্রজন্মের শিল্পীদের দিয়ে পরিবেশিত 'ভালোবাসো মোর গান' অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের রিয়েলিটির শোর যাত্রা এনটিভি থেকে শুরু হয়েছে। যেমন 'ক্লোজআপ ওয়ান তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ', রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান 'সুপার শেফ', কমেডি শো 'হা-শো'সহ আরো অনেক রিয়েলিটি শো আমরা প্রথম প্রচার করেছি। সাবিনা ইয়াসমিন ও রুনা লায়লাকে একসঙ্গে করে প্রথমবারের মতো 'অন্তরতর গানের ভুবন' নামে অনুষ্ঠান করেছি। এনটিভির বর্ষপূতির একটি অনুষ্ঠানে কিংবদন্তী শিল্পী আলমগীর ও রুনা লায়লা প্রথম একসঙ্গে দ্বৈত সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। 'ক্লোজআপ ওয়ান' থেকে তো অনেক সঙ্গীত

শিল্পীরই জন্ম হয়েছে। রান্না অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে শারমীন লাকির উপস্থাপনায় আমাদের 'সিদ্দিকা কবীর'স রেসিপি একটি মাইলফলক হয়ে আছে।
অনেক নির্মাতা, উপস্থাপক, শিল্পী, নাট্যনির্মাতা, লেখক এবং কলাকুশলী আছেন, যাঁদের শুরু এনটিভির পর্দায়। তাঁরা আজ স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত এবং জনপ্রিয় হয়েছেন। বিটিভিতে অনেক সৃজনশীল কাজ করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু নানা সীমাবদ্ধতার কারণে সেগুলো পূরণ করা সম্ভব হয়নি। আমার এই দ্বিতীয় জীবনে এসে এনটিভি পরিবারের আন্তরিক সহযোগিতায় কিছুটা হলেও সেসব ইচ্ছে পূরণ করতে পারছি। আমার টেলিভিশনে দুই জীবনের এত ঘটনা, এত দীর্ঘ চড়াই-উত্রাই, সাফল্য ও ব্যর্থতার সব কথা বলা হলো না এই স্বল্প পরিসরে। স্মৃতির পাতায় আরো অনেক কথা জমা রইল। সেসব হয়তো বলা যাবে অন্য কোনোখানে।

ব্যক্তিগত জীবন?
স্ত্রী বিশিষ্ট শিল্পী জিনাত রেহানা। আমাদের দুই সন্তান—এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে রেহান কামাল আইটি বিশেষজ্ঞ। এখন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। মেয়ে রেহনুমা কামাল আহমেদ বিবাহিত। সে বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারে নিয়মিত সংবাদ পাঠ করে, তার স্বামী বাংলাদেশ বিমানের পাইলট ক্যাপ্টেন ইশরাত আহমেদ। আমার ছেলের দুই মেয়ে ও এক ছেলে—সাকিনা, জারিনা ও নাসির। মেয়ের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে—ইবরাত মহিউদ্দিন আহমেদ ও নাভিনা নুমারাত। তাদের নিয়ে সুখেই কাটছে আমার দিন।

শ্রুতলিখন : ওমর শাহেদ ও সুমাইয়া সীমা
(৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭, এনটিভি ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা)